প্রথম অধ্যায়

উপন্যাসের ভাষাশিল্প

প্রথম অধ্যায়

উপন্যাসের ভাষাশিল্প

সাহিত্য গড়ে ওঠে ভাষা দিয়ে। স্বাভাবিকভাবে উপন্যাসও বিশেষ মাত্রা পায় ভাষার কারুকর্মে। উপন্যাস তথা কথাসাহিত্য জীবনের প্রসঙ্গকে উন্মোচিত করে ভাষার শিল্পিত রূপ দিয়ে। যেহেতু উপন্যাস গদ্য ভাষায় রচিত এবং কাল্পনিক আখ্যানের মাধ্যমে জীবনের বিশ্লেষণ, তাই জীবনের সামগ্রিক রূপের অনুসন্ধানই এখানে লক্ষ্য হয়ে ওঠে। জীবন ও জীবনের বিন্যাসগত রূপ দুই-ই উপন্যাসের পাতায় আমরা দেখতে চাই এবং অবশ্যই ভাষা সেখানে বিশেষ ভূমিকা নিয়ে থাকে।

উপন্যাসের মূল অবলম্বনই তার ভাষা। কাহিনি-চরিত্র-পরিবেশ যা উপন্যাস-সাহিত্যের দেহাবয়ব সবকিছুরই মূল ভিত্তি এই ভাষা ভূমি। এবং ভাষা কাহিনি-কাঠামোকে প্রাণময় মূর্তি করে তোলে। সমালোচকের ভাষায় বলতে পারা যায়—*'ভাষা উপন্যাসের ভাবপ্রকাশের নিছক এক যান্ত্রিক বাহন মাত্র নয়, কেবল জীবনের বহিরঙ্গ অবয়বকে গড়ে তোলার শিল্প-সৌন্দর্যহীন উপায় মাত্র নয়, এর অতিরিক্ত আরো গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ এক মাত্রা যোজনা করতে সক্ষম উপন্যাসের ভাষা।'*[১] ঔপন্যাসিকের জীবনবিষয়ক বক্তব্য-জীবনের তীব্র দ্বন্দ্বময় নাট্যস্বরূপ অথবা গভীর অন্তর্লীন কাব্যসৌন্দর্য সবকিছুই যথাযথ প্রকাশিত হয় সজীব স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রাণবন্ত ভাষাবিন্যাসেরই মাধ্যমে।

ভাষার অপরিহার্যতা প্রসঙ্গে *'বাংলা ভাষা পরিচয়'* গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন: *'কোঠাবাড়ির প্রধান মসলা ইট। তারপরে থাকে চুনসুড়কির নানা বাঁধন। ধ্বনি দিয়ে আঁটবাঁধা শব্দই ভাষার ইট, বাংলায় তাকে বলি কথা। নানারকম শব্দচিহ্নের গ্রন্থি দিয়ে এই কথাগুলোকে গেঁথে গেঁথে হয় ভাষা।'*[২]

ভাষাবিদ সুকুমার সেন ভাষার সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন এভাবে—*'মানুষের উচ্চারিত অর্থবহ বহুজনবোধ্য ধ্বনি সমষ্টিই ভাষা। ভাষা মানুষের জন্মসূত্রে পাওয়া।'*[৩] তাহলে দেখা যায়, সভ্যতার সূচনা থেকে ভাষা মানবমনকে উন্মোচিত করে আসছে এবং কালক্রমে এই ভাষা-ভাবনাই সাহিত্যের অবলম্বন স্বরূপ হয়েছে—জটিল গূঢ় জীবনের ও মানবমনের অন্দর-মহলের বিচিত্র কলতান সাহিত্যের ভাষায় রূপ পেয়েছে। নেহাৎই মুখের ভাষা রূপান্তরিত হয়ে সাহিত্যের ভাষায় বর্ণময় উজ্জ্বলতা লাভ করেছে। তবে ভাব-প্রকাশের মাধ্যম এই যে ভাষা সেটি কোনো বিচ্ছিন্ন প্রসঙ্গ নয়। জীবনের সমস্ত স্তরেই তার থাকে শিকড় ছড়ানো যা সমস্ত দিক থেকেই রস সঞ্চয় করে বৃক্ষের মতোই বেড়ে ওঠে। মানুষের জৈবিক প্রয়োজনে যেমন তার সৃষ্টি, আবার মানুষের নান্দনিক তৃপ্তি দানেও তার ঘাটতি নেই। এই ভাষা-দেহ দিয়ে বিষয়-ভাবনাকে বিচিত্র রঙে, মাত্রায় বিন্যস্ত করে সাহিত্যিক তার বিবিধ প্রকাশমাধ্যম রচনা করে চলেন এবং এর ফলে উপন্যাস-গল্প-নাটক-প্রবন্ধ ইত্যাদির সৃষ্টি ঘটে। সাহিত্যকর্মের প্রকাশমাধ্যম বা ভাষাশৈলী যার মাধ্যমে শিল্পীর আত্মগত অনুভূতির অংশীদার হয় সহৃদয় পাঠকবর্গ, সেটিই অ্যারিস্টটল বর্ণিত 'means of imitation' বলে অভিহিত।

উপন্যাস-তথা সাহিত্যকর্ম, মানুষের ইচ্ছে ও জীবন-অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরে। বিশেষত উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের বক্তব্য, উদ্দেশ্য, ইচ্ছে অভিজ্ঞতা রূপায়িত হয়। এবং ঘটনা, চরিত্র, পরিবেশ ইত্যাদি রচনায় সেই তাৎপর্যময় ব্যঞ্জনা প্রকাশে লেখক সৃষ্টিশীল সাহিত্যের নিয়মে মনোযোগী হন। একারণেই প্রকৃত সাহিত্য-রচনা হিসাবে উপন্যাস সৃষ্টি পর্বে ঔপন্যাসিক প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে ভাষাশিল্প রচনায় যথেষ্ট সচেতন হয়ে ওঠেন। নতুবা ভাষার শিথিলতা ও অবিন্যস্ত প্রয়োগ শিল্পীর অভিপ্রেত প্রত্যাশার শিল্পায়নের পরিপন্থী হয়ে পড়ে। উপন্যাস কাহিনিমূলক সাহিত্য বলেই নির্বাচিত সংস্থান, চরিত্র, পরিবেশ প্রভৃতির যথোপযুক্ত সংস্থাপনের প্রসঙ্গ এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অন্যদিকে যোগ্য ভাষা প্রয়োগেই এর সংস্থান-চরিত্র প্রভৃতি অর্থপূর্ণ হয় অর্থাৎ বক্তব্য রূপায়ণের জন্য উপযুক্ত প্রক্রিয়া ও ভাষা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল—যেটি বিঘ্নিত হলে বিষয় তার তীক্ষ্ণতা ও তীব্রতা হারিয়ে ফেলে। অর্থাৎ ভাব অনুসারী ভাষা-সৃজন কথাসাহিত্যিকের দায়িত্বকর্ম আবার ভাষার ভাব-অতিক্রমকারী একটি শক্তিও থাকার প্রয়োজন—ভাব ও ভাষার সুসমঞ্জস ব্যবহারই ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব। ভাষাসৃষ্টির মুহূর্তে ঔপন্যাসিক অর্থবহ শব্দবন্ধের মাঝে ছবি-সুর ও প্রাণের সঞ্চার করেন — ভাব-অতিক্রমকারী সামর্থ্য প্রদান করেন।

উপন্যাসের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এই প্রকরণে একই সঙ্গে কাহিনি-কাব্যধর্ম-নাটকীয়তা ও বর্ণনা সমান গুরুত্ব পেয়ে থাকে; যেটি এর প্রকাশরীতি বা ভাষাপ্রবাহের শোষণরীতিকে বাড়িয়ে দেয়—এ-সমস্ত কিছুকেই সমানভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা অর্জন করে উপন্যাসের ভাষা যেটি সাহিত্যের অন্য প্রকরণ যথা কাব্য-নাটকের ক্ষেত্রে সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। উপন্যাসের ভাষার এই বহুমাত্রিক শক্তি দেখে বিস্মিত হতে হয়। তবে এটি কোনো বহিরঙ্গ প্রসঙ্গ নয়, এটি উপন্যাস-কর্মের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্টে জড়িত। শিল্পীর উপলব্ধিগত সত্যবোধই এর প্রেরণাস্বরূপ। ভাষারীতিকে কখনই উপন্যাস থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতকে এ-প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করতে পারি—*'উপন্যাসের ভাষা, উপন্যাস-নিরপেক্ষ কোনো ব্যাপার নয়, ছাপা ও বাঁধাইয়ের মত পৃথক উচ্চারণে উপন্যাসের ভাষার প্রতি সমালোচকের কর্তব্য শেষ হয় না—ফ্লবেয়ারের মন্তব্যটি এখানে ঔপন্যাসিকের যথেষ্ট সহায়ক—'If you know exactly what you want to say you will say it well.' ভাষাকে ফ্লবেয়ার কখন বহিরঙ্গ সৌন্দর্য হিসাবে গ্রহণ করেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন, শিল্পীর সত্যভাবনার ত্রুটি তাঁর ভাষা-বিন্যাসের সামান্যতম ত্রুটিতেও প্রতিফলিত হয়।'*[৪]

উপন্যাসের ভাষা আলোচনা সূত্রে style-র প্রসঙ্গ এসে পড়ে। যেহেতু ভাষার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে তার স্রষ্টার ব্যক্তিধর্মের বিশেষত্ব তাই এ-প্রসঙ্গে style আলোচনা করতেই হয়। style-র সংজ্ঞা নিয়ে বিবিধ বিতর্ক আছে তবে এ বিষয়টি যে ভাষা বা ভাষারীতির অতিরিক্ত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। স্টাইল বলা যায় সজ্জিত ভাষা অথচ সেটি ভাষার প্রকৃতি থেকেই জাত—যে-কারণে সেটি অকৃত্রিম হয়। ভাষা বিষয়টিকে বলতে পারি নমনীয় এক উপাদান—যাকে দুমড়ে মুচড়ে অন্তহীন রূপ দেওয়া যায়। যেটির কারণে স্টাইল সম্ভবপর হয়ে ওঠে। স্টাইল একজাতীয় স্বভাবজাত আর্ট, কোনো অনুশীলন-জাত কৃত্রিমতা তার নেই। স্টাইল ভাবকে স্থায়িত্ব দেয়, তাকে নিখুঁতভাবে প্রকাশ করে। শিল্পীর অন্তরমানসকে style সার্থক ভাবে তুলে ধরে। সমালোচক অর্বন্তীকুমার সান্যাল এই আলোচনা প্রসঙ্গে স্টাইল-র স্বরূপ এভাবেই বিশ্লেষণ করেছেন—*'স্টাইল ভাষার সজ্জীকরণ-ভাবের শিল্পময় প্রকাশ-অন্তরমানসের প্রস্ফুটন, মানুষটি এবং তাঁর ভাবজীবনটি—এদের সবকটিই স্টাইলের সংজ্ঞা হতে পারে।'*[৫]

গদ্যলেখকের স্টাইলের স্বরূপ বিচার করা কঠিন এক প্রসঙ্গ। আসলে স্টাইল আলোচনার দু'টি দিক আছে—একটি বিচারের ও অন্যটি অনুভবের। বিচারের দিকটি হল—শব্দ-অর্থ, শব্দযোজন, বাক্যগঠন, অলংকার—ভাব ও চিন্তার পারম্পর্য—আর অনুভবের দিকটি হল এদের সমস্তকিছুর সামগ্রিকতা।

প্রতিটি লেখকের নিজস্ব রচনা-লক্ষণ থাকে—যা তাঁর ধ্বনি-বিন্যাস, শব্দসংস্থান, বাক্যযোজনা, অনুচ্ছেদ, স্তবকরচনা, রচনার আরম্ভ ও উপসংহার ইত্যাদি সমস্ত কিছুতেই প্রকাশিত হয়। শিল্পীর এই যে চিন্তার মৌলিকতা তাকে অ্যারিস্টটল পর্যন্ত অস্বীকার করতে পারেননি। *'কাব্যতত্ত্ব ও অ্যারিস্টটল'* গ্রন্থে প্রাবন্ধিক শিশির কুমার দাশ একথাটি বলেছেন—*'যেমন কাহিনি গঠনের ব্যাপারে অ্যারিস্টটল স্বীকার করেছেন কবির স্বাধীনতা, তেমনই রচনাশৈলীতে সমর্থন করেছেন কবির স্বাধীনতা। ... কবি প্রচলিত অ-প্রচলিত দেশী বিদেশী সব শব্দ ব্যবহার করেন, কবি নতুন শব্দ তৈরী করবেন, অলঙ্করণ করবেন তাঁর ইচ্ছেমত, তাঁর প্রয়োজন অনুসারে। অনেকে তালিকা তৈরী করে দিয়েছেন, কি লিখতে হবে, কি লেখা বারণ, কি ধরণের বর্ণনা চাই। অ্যারিস্টটল শৃঙ্খল রচনা করেননি। তিনি দেখেছেন কবির উদ্দেশ্য কাব্যের প্রয়োজন।'*[৬]

স্টাইল বা রচনা-প্রকরণে শিল্পীর নিজস্ব ব্যক্তিকতার প্রসঙ্গটিকে পবিত্র সরকার তাঁর *'গদ্যরীতি ও পদ্যরীতি'* গ্রন্থে লিখেছেন—*'স্টাইল হল আলাদ হওয়া একটি norm বা আদর্শ থেকে সরে আসা। সাধারণ থেকে বিশেষে পৌঁছানো। যা সকলের তা থেকে ব্যক্তিগত কোন অংশে উত্তীর্ণ হওয়া।'*[৭]

দেখা যায় প্রতিটি লেখকের স্টাইল পৃথক। তাই ছক বাঁধা প্রচলিত বাক্য, ছাঁচে ঢালা শব্দ তার ব্যবহার করলে চলে না। তাঁকে শব্দকে নতুন ভাবে আবিষ্কার করতে হয়, গঠন করতে হয়, চিন্তাকে বিশেষভাবে প্রকাশ করতে গিয়ে নিজস্ব ভাব ও ভঙ্গি দিতে হয়। পাশ্চাত্য প্রাবন্ধিক Marjorie Boutton-র *'Anatony of prose'* গ্রন্থে এর সমর্থন মেলে এভাবে—*"When we are styling a prose style, we find that grammar has its limitations as a guide to what is good. It we wish to write well ourselves, we had better with grammatically, but very good author may ungrammatical language, unidiomate language and ever very vulger or slanging language in order to suggest the kind of person who is speaking."*[৮]

বস্তুত পরিচিত শব্দসমূহ ও বাক্‌ভঙ্গিই Style-র স্বচ্ছতা গড়ে তোলে। শব্দগ্রহণের ক্ষেত্রে বাঁধাধরা নিয়ম মানার প্রয়োজন নেই। যে শব্দ ভাববস্তুকে সার্থক প্রকাশ করতে সমর্থ সেই শব্দটির অভিপ্রেত শব্দ, ইতর-সাধু বলে এমনকি দেশি-বিদেশি বলেও শব্দের কোনো বর্ণভেদ নেই। শব্দের যথাযথতাই মূল প্রসঙ্গ। যাতে অতিশয্য বর্জিত হয়ে সংক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে ভাষা। পরিচ্ছন্ন সহজ সরল গদ্যভাষা ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত হয়ে যায় রচনা-কর্মের ভাষায়।

সাহিত্যির বঙ্কিমচন্দ্রে চট্টোপাধ্যায় ভাষার সরলতা, মাধুর্য ও স্পষ্টতাকে অধিক গুরুত্ব দিতেন। এই কারণে ভাষা সৃষ্টিতে বাছবিচার না করে যা প্রয়োজন তা তিনি গ্রহণ করেছেন এবং তার উৎসস্থল সম্পর্কে আপত্তি তিনি রাখেননি।

এই স্টাইল বা রচনারীতি যা লেখকের ব্যক্তির প্রকাশক তা একই সঙ্গে চিরনতুন ও চিরপুরাতন। David lodge-র ভাষার বলতে ইচ্ছে হয়- Style is a technique of exposition should perhaps have been placed first since it is older.[৯]-স্টাইলের ব্যক্তিগত অথচ সর্বজনীন ব্যঞ্জনা সম্পর্কে বিস্মিত হতে হয়। এর সংজ্ঞা নির্ণয় করার চেষ্টা করলে তা অস্পষ্ট ও সীমাবন্ধ হয়ে পড়ে। এই সংজ্ঞাপ্রকাশের সীমাবদ্ধতার কথাই প্রবন্ধিক "David lodge আলোচনা করেছেন- Style as the highest achievement of literature is a little vague, but it is classified else where in the book, and by a more precise defination. The complete relation of a universal significanse in a personal and particular expression. It is an all inclusive concept of style in the sense that it takes in everything that we value in litarary works of art".[১০]

ভাষাশিল্পে Style আলোচনার প্রেক্ষিতে বাংলা গদ্য তথা উপন্যাস সাহিত্যের ভাষাকল্প পর্যালোচনা সূত্রে আমরা বলতেই পারি যে, বাংলা উপন্যাস তার জন্মক্ষণ থেকে অধুনাকাল পর্যন্ত ব্যক্তিবৈচিত্র্য ও বিশিষ্টতায় সমৃদ্ধ। বহু লেখকের বিচিত্র রচনাশৈলী উপন্যাসের ভাষাকে ঋদ্ধ করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথও এ-ভাষার সম্পদ ও প্রাচুর্যে অভিভূত হৃদয়কে তুলেছেন এ ভাষায়—'আজ যে বাংলাভাষা বহু লক্ষ মানুষের মন চলাচলের হাজার হাজার রাস্তার গলিতে আলো ফেলে সহজ

করেছে, পরস্পরের প্রতি মুহূর্তের বোঝাপড়া আলাপ পরিচয় এর দীপ্তির পথরেখা অনুসরণ করে চললে কালের কোন দূরদুর্গম দিগন্তে গিয়ে পৌঁছাব।'[১১]

দেখে বিস্মিত হতেই হয় যে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ধারা উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে বহু পথ অতিক্রম করে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার উপলখণ্ডে সমৃদ্ধ হয়ে বয়ে চলেছে এক অজানা ভবিষ্যতের দিকে। যা প্রতিমুহূর্তের পথচলার অভিজ্ঞতাকে সযত্নে সঞ্চয় করে চলেছে যার প্রতি সতৃষ্ণ পাঠকের লুব্ধতা চোখে পড়ার মতো। উপন্যাসের ভাষাতে সেই বিচিত্র প্রাণসত্তার অনুভব করে পাঠক, ও সেই ভাষা-অবয়ব চুম্বকের মতো আকৃষ্ট করে পাঠককে।

উপন্যাসের ভাষা-আলোচনার পরম্পরায় প্রথমেই সার্থক উপন্যাস স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষারীতির প্রসঙ্গে আলোচনা অবশ্য কর্তব্য। তাঁর ভাষারীতি সমকালেই স্বতন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। কল্পনা ও রোমান্সের গভীর অনুভবের মিশ্রণে জারিত ছিল এ-ভাষা। সহজ আটপৌরে জীবনের ক্ষুদ্র চৌকাঠ পেরিয়ে বহির্জগতের অসীম রহস্যময়তা ও সৌন্দর্যকে ব্যঞ্জিত করেছে সে-ভাষা। বাংলা গদ্যভাষা জড়ত্ব ত্যাগ করে তাঁর ছোঁয়ায় গতিশীল, চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। ভাষাশিল্প বহুবর্ণে রঞ্জিত হল তাঁর অসাধারণ চেতনার স্পর্শে। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমী ভাষার অসামান্যতার কথা বলেছেন এ-ভাবে—*'তাঁর আগে ভাষার অসাড়তা ছিল, তিনি জাগিয়ে দেওয়াতে তার যেন স্পর্শবোধ গেল বেড়ে। নতুন কালের নতুন আহ্বানে সে সাড়া দিতে শুরু করল। অল্পকালের মধ্যেই আপন শক্তি সম্বন্ধে সে সচেতন হয়ে উঠল, বঙ্গদেশের পূর্বেকার ভাষা আর পরের ভাষা তুলনা করে দেখলে বোঝা যায় একপ্রান্তে একটা বড় মনের নাড়া খেলে দেশের সমস্ত মনে ঢেউ খেলিয়ে যায় কত দ্রুতবেগে, আর তখনি তখনি তার ভাষা কেমন করে নতুন নতুন প্রণালীর মধ্যে আপন পথ ছুটিয়ে চলে।'*[১২]

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের ভাষায় গতিময়তা ও সপ্রাণতার অনায়াস প্রকাশ এভাবেই ঘটেছে—*'নগেন্দ্র দত্ত নৌকারোহণে যাইতেছিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাস তুফানের সময়, ভার্যা সূর্যমুখী মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, দেখিও নৌকা সাবধানে লইয়া যাইও তুফান দেখিলে লাগাইল। ঝড়ের সময় কখনো নৌকায় থাকিও না।'*[১৩]—ছোটো ছোটো বাক্যাংশে গঠিত দীর্ঘ জটিলবাক্য, ক্রিয়াপদের লঘুতা, দ্রুতলয়ের ভাবভঙ্গি—সব মিলিয়ে সমকালের গদ্যধারায় বঙ্কিমী গদ্যরীতি নতুন জোয়ার আনে। এভাষা নদীস্রোতের মতোই ভরা আনন্দে ছুটে চলেছে যেন। *'রজনী'* উপন্যাসে সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের মনোবিশ্লেষণমূলক মর্মস্পর্শী-প্রাণময় ভাষা খুঁজে পাই এভাবেই:

অমর। . . . . যাইব না কেন? আমাকে যাইতে বারণ করিবারও কেহ নাই,

লবঙ্গতা। . . . যদি আমি বারণ করি?

অমরনাথ । . . . আমি তোমার কে যে বারণ করবে?

লবঙ্গলতা . . . তুমি আমার কে তাও জানিনা। এ পৃথিবীতে তুমি আমার কেহ নও। কিন্তু যদি লোকন্তর থাকে। [১৪]

– ছোটো ছোটো কাটা কাটা প্রশ্নবোধক বাক্যের নাটকীয় স্বাদ এ–গদ্যরীতিতে উচ্ছ্বসিত। এর তীক্ষ্ণতা সহজ অথচ ধারাল স্পর্শ মনের গভীরে প্রবেশ করে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ভাষারীতি সমকালের গদ্যভাবনায় বঙ্কিমী–মননের স্পর্শে সম্পূর্ণই ছিল অনন্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সাহিত্য–জীবনের প্রথম পর্বে উপন্যাস ও প্রবন্ধে মূলত বঙ্কিমীভাষাকেই অনুসরণ করেছিলেন। ক্রমে বঙ্কিমী ভাষারীতিকে অতিক্রম করে নিজ ব্যক্তিত্বে–সমৃদ্ধ হয়ে উঠল তাঁর ভাষা–ভাবনা। সরল বাক্যে গঠনের প্রতি তাঁর নিজস্ব পক্ষপাত থাকলেও দীর্ঘায়ত সরলবাক্য তিনি গঠন করলেন। অনেকক্ষেত্রেই তাঁর যৌগিক বাক্যগুলিতে সংযোজক অব্যয় পদের ব্যবহার হয়নি – ফলে সেগুলি যেন সরল বাক্যের সমষ্টিতে পরিণত হয়েছে। জটিল বাক্যগঠনের ক্ষেত্রেও অব্যয়পদের ব্যবহার করেননি শিল্পী। ফলে বাক্যাংশগুলি নির্ভরহীন স্বাধীন ভঙ্গিতে কবিতার মত উচ্ছ্বসিত হয়েছে। 'বউঠাকুরানীর হাট' – এর ভাষা উদ্ধৃত করে বলা যায় – "কিন্তু যখন সেই রাত্রে নিদ্রা ভাঙিয়া সহসা তিনি দেখিলেন, বিভা শয্যায় বসিয়া কাঁদিতেছে, তাহার মুখে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, তাহার অর্ধ–অনাবৃত বক্ষ কাঁপিয়া উঠিতেছে, তাহার মধুর করুন দুটি চক্ষু বহিয়া জল পড়িতেছে"[১৫] – কিন্তু সংযোজক অব্যয় বাক্যের প্রারম্ভে বসলেও জটিল বাক্য নির্দেশক অব্যয়পদ 'যে'র ব্যবহার না হয়ে বিবৃতিকে শিল্পময় উচ্ছ্বাসে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।

রবীন্দ্র সৃষ্ট চলিত গদ্যের ভঙ্গিতে দ্রুততা প্রথম থেকেই ধরা পড়েছে। তার চলতি গদ্যের দ্রুত রূপরীতি কাটাকাটা এবং একটানা নিয়মিত পদক্ষেপে ছোটা দৌড়ের ঘোড়ার মতো। এ গদ্য সম্পর্কে তাঁর অভিমত ছিল – তারুণ্যের জয় ঘোষণা করবে এ নতুন ভাষারীতি, যা পুরানো সংরক্ষণশীলতা থেকে মুক্ত হয়ে উদ্ধত বেগে মানুষের সুপ্ত মনকে নাড়া দিয়ে পায়ের তলার যাবতীয় জঞ্জাল কাঁটা সরিয়ে রেখে পথ খোলসা করে এগিয়ে চলবে। রবীন্দ্রনাথের ভাবপ্রেরণা এই পর্বে নবভাবনায় উদ্বোধিত হয়েছিল এবং সেটি প্রকাশের নতুন মাধ্যম চলিত গদ্যেই যেন মুক্তি পেল। 'শেষের কবিতা'–র গদ্যভাষা উদ্ধৃত করলে এ–গদ্য পাই এ ভাবে – 'অবশেষে বেরিয়ে এল অমিত, সঙ্গে নিয়ে এল লাবণ্যকে। লাবণ্যের মুখে একটি নির্লিপ্ত শান্তি। তাতে একটুও রাগ নেই, স্পর্ধা নেই, অভিমান নেই। যোগমায়া পিছনের ঘরেই ছিলেন, তাঁর বেরোবার ইচ্ছা ছিল না।

অমিত তাকে ধরে নিয়ে এল। এক মুহূর্তের মধ্যেই কেটির চোখে পড়ল লাবণ্যর হাতে আংটি। মাথায় রক্ত চন করে উঠল, লাল হয়ে উঠল দুই চোখ, পৃথিবীটাকে লাথি মারতে ইচ্ছে করল।' [১৬]

পরবর্তীকালে রবীন্দ্র-গদ্যে সাধুরীতি ব্যবহৃত হলেও তার ভঙ্গিতে কথ্য-ভাষার লঘুতা ও বাহুল্যহীনতা দেখা গেল। এ-সময়ে সাধুরীতিটি তার ভাষার বহিরঙ্গমাত্র ছিল। চলিত রীতির কাঠামোয় সাধু ক্রিয়াপদ ও অসমাপিকার ব্যবহার ও চলিত সর্বনামের অন্বয় করেছেন। যেটি ভাষাপ্রবাহে স্বাচ্ছন্দ্যের পাশাপাশি সাধুর তরঙ্গিত তালের সঙ্গে চলিতের ছোটো বাক্যের প্রক্ষেপে তালে বৈচিত্র্য এনেছিল।—*'জানিনা কতক্ষণ পরে ... সেটা বোধকরি ঘুম নয় অসাড়তার একটা পাতলা চাদর আমার চেতনার উপরে ঢাকা পড়িল। এক সময়ে তন্দ্রাবেশের ঘোরে আমার পায়ের কাছে প্রথমে একটা ঘন নিঃশ্বাস অনুভব করিলাম। ভয়ে আমার শরীর হিম হইয়া গেল। সেই আদিম জন্তুটা।'* [১৭] —বাক্যরচনার বিশেষত্ব, শব্দের স্থানগত পরিবর্তন, কথোপকথনের আন্তরিক ভঙ্গি সাধু গদ্যের প্রচলিত ধারায় নতুন এক সংযোজন ঘটাল। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের গদ্যভাবনা সাধু বা চলিত যাই হোক না কেন কল্পনা ও অনুভবের সূত্র সৌন্দর্যময়তায় তা শিল্পিত। *'মালঞ্চ'* উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ যেন চলতি গদ্যের কল্লোলধ্বনি শোনালেন। সে ভাষার স্বর এরকম—*'দিঘির ওপারের পাড়িতে চালতাগাছের আড়ালে চাঁদ উঠেছে, জলে পড়েছে ঘন কালো ছায়া। এ-পারে বাসন্তী গাছে কচিপাতা শিশুর ঘুমভাঙা চোখের মত রাঙা, তার কাঁচাসোনার বরণ ফুল, ঘন গন্ধে ভারী হয়ে জমে উঠেছে গন্ধের কুয়াশা যেন। জোনাকির দল ঝলমল করছে জারুল গাছের ডালে।'* [১৮]— চলিত ভাষার স্বচ্ছতায় সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে—এ গদ্য স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সৃষ্টি, যেন বিশ্লেষণের অতীত এর ভাষারীতি—এটি সম্পূর্ণ এক অনুভবের বস্তু। এই অন্তর্লীন গদ্যরীতিই রবীন্দ্র উপন্যাসের ভাষাশিল্প।

রবীন্দ্র-উপন্যাসের ভাষারীতি রবীন্দ্র-চেতনারই উদ্ভাসিত এক কলামাধ্যম।

ঔপন্যাসিক 'শরৎচন্দ্রের' ভাষা রবীন্দ্র-উপন্যাসের ভাষার মতো শিল্পময় অনুভব সমৃদ্ধ নয়, তবে আগাগোড়া পরিচ্ছন্নতা এ-ভাষার বিশেষ গুণ যেটি রবীন্দ্র-উপন্যাসের ভাষার সঙ্গেই তুলনীয়। তাঁর ভাষাকল্পের জাদুময়ী গদ্যলেখন-নিপুণতা-ঘরোয়া-সংলাপ ও বর্ণনার স্বাভাবিকতা পাঠকবর্গকে চুম্বকের মত আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর সৃষ্ট ভাষা অলংকার সমৃদ্ধ কারুকার্যগঠিত বৈদগ্ধ্যপূর্ণ ভাষা নয়, সহজ সরল জীবনের গভীরতম প্রদেশে এ-ভাষার শিকড় ছিল ছড়ানো মানুষের মনের দাবি

প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর ভাষায়। তাঁর রচনা হৃদয়-প্রধান হয়ে উঠেছে—সহজ অথচ আবেদনময় ভাষা, সমাজের সকলশ্রেণির মানুষের অন্তরহৃদয় তুলে ধরেছেন শিল্পী। যে ঘটনা যে ভাবে ঘটেছে ঠিক সেভাবেই তাঁর উপন্যাসের ভাষায় তা রূপান্তরিত হয়েছে। ভাষার কৃত্রিম ঐশ্বর্য কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারেনি। তাঁর ভাষা স্বচ্ছ আড়ম্বরহীন প্রাত্যহিক জীবনের আটপৌরে রসে ছিল পরিপূর্ণ। এ-ভাষায় স্বচ্ছতা আছে কিন্তু জীবনের তুচ্ছতা নেই, দৈনন্দিনতায় ঝকমক করছে এ-ভাষাশিল্প।

শরৎচন্দ্র সাধারণত উপন্যাস রচনায় বহিরঙ্গ বা কাঠামো রচনা করতেন সাধু গদ্যে আর সংলাপ তৈরি করতেন চলিত গদ্যে। বিবৃতি রচিত হত সাধু গদ্য ভাষায় আর চরিত্রের উক্তিপ্রত্যুক্তি চলিত গদ্যে তিনি স্বতঃস্ফূর্ত করে তুলতেন। তাঁর সাধুভাষা যেন চলিত ভাষারই অপর পিঠ। গদ্যভাষাতে তিনি সাধু ও চলিতের সার্থক সমন্বয় ঘটিয়েছেন। এ-গদ্যভাষায় অলংকার সমৃদ্ধ সাধুভাষার মন্থরতা নেই আবার চলিত গদ্যের অলংকারহীন আতিশয্যবর্জিত ত্বরিতগতি নেই—দুইয়েরই মিলিত আশ্চর্যরূপ এ-ভাষা। সাধু গদ্য ও চলিত গদ্য এ-দুয়ের মাঝখানে কোনো কৃত্রিম ব্যবধানকে শরৎচন্দ্র মানতে রাজি ছিলেন না। বস্তুত এ-দুয়ের মধ্যে কোনো দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান নেই, অন্তত যে ভাষা প্রাণবান তাতে এ ব্যবধান থাকা উচিত নয় বলেই শিল্পী মনে করতেন। পূর্ববর্তী বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি ঔপন্যাসিকদের ভাষাশিল্পের মূল্যায়ন করেছেন তিনি এভাবেই যে বঙ্কিমী গদ্যের গুরুগম্ভীর রীতিটি ত্যাগ করাতেই বাংলা গদ্যের মুক্তি ঘটবে ও রবীন্দ্র-কবিস্বভাব-বিশিষ্ট ব্যঞ্জিত সাধু ও চলিত গদ্যরীতির উত্তরসূরিত্ব লাভ করার মতো প্রতিভাবান তিনি ছিলেন না। তাঁর গদ্য হয়ে উঠেছিল তাই সহজ স্বতঃস্ফূর্ত জীবনের সংস্পর্শজাত সরলীকরণ। অথচ সংবেদনশীল হৃদয় বেদনা উদ্ঘাটনের দক্ষ মাধ্যম।

তাঁর হাতে যে রীতি উৎকর্ষ লাভ করেছে সে রীতি হল সাধুগদ্যরীতি। কৃত্রিমতা ও সম্ভ্রম-বাচক দূরত্ব বর্জিত এ-ভাষার বিশেষ গুণ জীবনের ছোঁয়া। *'শ্রীকান্ত'* উপন্যাসে শ্রীকান্তের জীবনদর্শন সাধুভাষায় এভাবে শিল্প হয়ে উঠেছে —*'এই ছন্নছাড়া জীবনের যে অধ্যায়টা সেদিন রাজলক্ষ্মীর কাছে শেষ বিদায়ের ক্ষণে চোখের জলের ভিতর দিয়া শেষ করিয়া দিয়া আসিয়াছিলাম, মনে করি নাই, আবার তাহার ছিন্ন-সূত্র যোজনা করিবার জন্য আমার ডাক পড়িবে। কিন্তু ডাক যখন সত্যিই পড়িল, তখন বুঝিলাম, বিস্ময় এবং সঙ্কোচ আমার যত বড়ই হোক, এ আহ্বান শিরোধার্য করিতে*

লেশমাত্র ইতস্তত করা চলিবেনা।'[১৯]—শ্রীকান্তের বেহিসেবী জীবন-যাপনের দিনলিপি লেখক সহজ-স্বচ্ছন্দ্য সাধু গদ্যে ছোটো ছোটো বাক্যাংশে গ্রথিত মিশ্র-বাক্যে গঠিত করে জীবনের চিরপ্রবহমানতাকে উদ্ভাসিত করেছেন। জীবনের ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতিকে শরৎচন্দ্র অলংকৃত সরল গদ্যে রূপময় করেছেন। আড়ম্বরহীন সহজ প্রসন্ন জীবনরস এর বিশেষণপদ *ছন্নছাড়া-শেষ-ছিন্নসূত্র* ইত্যাদির প্রয়োগকুশলতায় ও অসমাপিকা ক্রিয়াপদ *'দিয়া'*-র দ্বিত্ব প্রয়োগ *'ডাক'* কৃদন্ত শব্দটির প্রয়োগে শ্রীকান্ত হৃদয়কে তুলে ধরেছে। সাধুগদ্যের পরিচিতি মূর্তি শিল্পীর একান্ত অনুভবের ছোঁয়া লেগে শিল্পলাবণ্য পেয়েছে।

শরৎচন্দ্রের চলিত-গদ্য যা উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে সেটিরও বিশেষত্ব হল এই যে সমকালে রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, সবুজপত্র ও কল্লোল গোষ্ঠী যখন চলতি গদ্যের জয়ধ্বজা ওড়াতে ব্যস্ত —সেই সময় তিনি এই আবহের প্রভাবে প্রভাবিত না হয়ে নিজ ব্যক্তিত্বময়তার কারণে এই প্রবল নবভাবনার জোয়ারে ভাসেননি। তাঁর জীবনবাদী মনন তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও জীবনের বিশ্লেষণের সহজ-সংযত প্রকাশভঙ্গির মাধ্যম খুঁজে পেয়েছিল তাঁর নিজ-সৃষ্ট চলিত গদ্যে। চলিত-গদ্য তিনি পাত্রপাত্রীর মুখে বসিয়েছেন। তবে ভাষাশিল্পীর সর্বদা সজাগ দৃষ্টি ছিল সংলাপ রচনায়। সংলাপের ভাষা যেন লঘু ও শিল্পমূল্যহীন না হয়ে পড়ে এটির প্রতি বিশেষ যত্নবান ছিলেন তিনি। তাঁর এই বিশেষ সচেতনতা প্রকাশ পায় শব্দচয়নে, ক্রিয়াপদ গঠনে, উপমা-রূপক উদ্ভাবনে। এ ভাষা সহজ সরল জীবনের প্রতিচ্ছবি অথচ এর মাধুর্য বিশ্লেষণের অতীত। এ চলিত ভাষার প্রাণশক্তি এভাবেই উপলব্ধি করা যায়—*'ছেলেবেলায় একবার যাকে ভালবাসা যায় তাকে কি কখনো ভোলা যায়? সে একটা অনুরোধ করলে কেউ কখনো কি পায়ে ঠেলে যেতে পারে? এমন নিষ্ঠুর সংসারে আর কে আছে।*'[২০]

শরৎচন্দ্রের গদ্যভাবনা ভাবাবেগময় শরৎচন্দ্রীয় হৃদয়সঞ্জাত ভাষাকলা। উপন্যাসের ভাষা-আলোচনায় আমরা লক্ষ করি এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র পূর্বসূরী এই তিন কীর্তিমান স্তম্ভের কাছে সমকাল ও পরবর্তীকালীন কথাসাহিত্য বিষয় ভাবনা ও ভাষাশিল্পকে গ্রহণ করে ঋণী হয়েছে। যদিও শরৎচন্দ্রের কাছেই সমকাল ও পরবর্তী প্রজন্মের ঋণ অশেষ। শরৎচন্দ্রই পরবর্তী উপন্যাস সাহিত্যের যে গতিনিয়ামক হয়েছেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাঁর সৃষ্টিকর্মের আড়ষ্টতা বর্জিত প্রত্যক্ষতা গুণই বাংলা সাহিত্য-ধারায় স্থায়ী দান বলা যায়। শরৎচন্দ্রের পর

বাঙালি জীবনের পটভূমি নানাভাবে বদলে গিয়েছে, ফলে বাংলা উপন্যাসেরও নানারকম পালাবদল হয়েছে। কিন্তু যতরকম পালাবদল হোক না কেন বাংলা উপন্যাসে জীবনকে আরো কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ করার প্রবণতা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের ভাষাও ক্রমে ক্রমে আরো স্পষ্ট ও স্বচ্ছ হয়েছে ও জীবনের ভাবে ঋদ্ধ হয়েছে।

তিরিশের দশক উত্তর শরৎচন্দ্রের যুগে তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে ছিল ভাস্বর। তাদের উপন্যাস ও ছোটোগল্পে যে দুর্লভ বলিষ্ঠতা ও তীব্র অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় আছে, যে বিশাল মানবতাবাদের কাহিনি উদ্ঘাটিত হয়েছে, সমকালের দেশচেতনা তথা ইতিহাসবোধের পরিচয় আছে তাতে শরৎচন্দ্রকে হারিয়ে আমাদের হতাশা নেই, নেই কোনো ক্ষোভ, তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী হিসাবে এঁরা প্রতিনিধিত্ব করেছেন। শরৎচন্দ্রের পর বাংলা উপন্যাসে কালান্তর ও রূপান্তর ঘটল এই পর্বটিতে। সর্বত্র বিষয় ভাবনা ও ভাষাকল্প এই অভিনবত্ব গায়ে মেখে নিজেকে উপস্থিত করল।

শরৎ-পরবর্তীকালে জগদীশচন্দ্র গুপ্তের উপন্যাসের ভাষায় ব্যতিক্রমী ব্যঞ্জনা চোখে পড়ে। জগদীশ চন্দ্র শরৎচন্দ্রেরই যেন গোত্রভূত, তাঁরই যেন মানসপুত্র—শরৎপ্রতিভারই যেন পরবর্তী রূপ বলে মনে হয়। তবে মনুষ্যত্ববোধের প্রতি আস্থা যা শরৎচন্দ্রের বিশেষত্ব সেটি জগদীশচন্দ্রে নেই। জগদীশ চন্দ্র সংশয়ী ও নাস্তিক চিত্তের অধিকারী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের যাবতীয় বিড়ম্বনার হেতু অমোঘ নিয়তির অন্ধতা—নিজেকে বাঁচাবার কোনো পথ মানুষের চোখের সামনে নেই—এক অলক্ষ্য হিংস্র শক্তির হাতে অশক্ত ক্রীড়নক সে। জগদীশচন্দ্রের নির্লিপ্ত মানসিকতা পূর্ববর্তী শরৎচন্দ্রে নেই, আবার শরৎচন্দ্রের হৃদয়বত্তা জগদীশচন্দ্রে নেই। নির্লিপ্ত ও এক অবিশ্বাসী মানস ধরা দিয়েছে তাঁর উপন্যাসের গদ্যভাষায়। সমালোচকের ভাষায় বলা যায়—*'দুঃখ মানুষের অস্তিত্বের অনিবার্য অঙ্গ আর এই উপলব্ধিতে জগদীশ গুপ্ত রূপায়িত করেছেন বিদ্রূপপ্রখর ঊনভাষী রচনারীতির বিশিষ্টতায়।'*[২১] বাস্তবিক বলাযায় তাৎপর্যময় ভাষার স্রষ্টা ছিলেন তিনি। *'অসাধুসিদ্ধার্থ'* উপন্যাসে অজয়ার প্রভাবে জেগে ওঠা মহানুভবতার অভিনয়ে অভ্যস্ত নটবরের আত্মসমালোচনা ও আত্মচিন্তার মধ্যে নিষ্ঠুর স্বার্থপরতার পাশাপাশি কারুণ্যের সঞ্চার করেছে এ ভাষায়—*'শুনতেই পাই জীবনযুদ্ধে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা কীটপতঙ্গে আছে উদ্ভিদে আছে—সেটা বিধিদত্ত প্রেরণা। তবে আমি মানুষ হয়ে কেন টিকে থাকিতে চাইব না? ... মনে মনে তাল ঠুকিয়া বলিল — আলবাৎ চাইব।'*[২২] — হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র ব্যঞ্জনাময় তাৎপর্য এ-ভাষায়

অনুরণিত হয়েছে। *'লঘুগুরু'* উপন্যাসে লেখক যন্ত্রণাহত অথচ শান্ত মানুষ বিশ্বম্ভরের রক্ষিতা ও টুকীর সংসার উত্তমের হৃদয়ানুভূতিকে এ ভাষায় বর্ণনা করেছেন এ ভাবে—*'এ চিন্তা তার নূতন নয় এবং তাই বলিয়া ছোট নয়—দীর্ঘদিন ধরিয়া সে অবাক হইয়া একটি নিমেষের কথা ভাবিয়া আসিতেছে। সেই একটি নিমেষে সমস্ত শক্তি অভিভূত পরাস্ত হইয়া সঙ্কীর্ণতম একটি পথের পাশে সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিয়াছিল—নিদারুণ অন্ধতার মাঝে সে যে পথে পা বাড়াইয়াছিল, আজ পর্যন্ত সে পথের শেষ হয় নাই—শেষ চোখে পড়ে না। যাহা হইতে পারিত তাহার চিত্রটা বোধ হয় অতিরঞ্জিত হইয়াই তাহার চোখের সামনে ভাসিতে থাকে।'*[২৩] এই বাক্যগঠনের অভিনবত্ব—এর বাক্যাংশ সংস্থাপনের বৈচিত্র্যে বিবৃতিটি উপন্যাসের ভাষাকে জটিল তথা অন্তর্দ্বন্দ্বময় নিরাসক্ত জীবনপর্যালোচনার মাধ্যমে পরিণত করেছে। প্রাক্তন-কর্মফলের সংঘাতে মানুষের স্বপ্নভঙ্গের কাহিনি শুনিয়েছেন তিনি। উপন্যাসের ভাষায় সেই হতাশা ব্যর্থতা বেদনা ফুটে উঠেছে।

উপন্যাসের ভাষা যে উপন্যাস নিরপেক্ষ কোনো প্রসঙ্গ নয়, এবং সেটি যে ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিত্ব সঞ্জাত ও এই ভাষার যে- কোনো নির্দিষ্ট প্রকরণ নেই —একই গৎ বাঁধা ছকে যে এটি রচিত হতেই হবে—এরকম কোনো প্রচলিত কর্মের আওতায় একে সীমাবদ্ধ করা যাবে না সেটি তিরিশের দশকের সার্থকতম শিল্পী কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের ভাষাভাবনাকে লক্ষ করলেই উপলব্ধি করা যায়। তাৎপর্যময় উপন্যাসের ভাষাস্রষ্টা হিসাবে তিনি অতুলনীয়। ভাষায় আসক্তিহীন সত্যান্বেষণ অনুচ্ছ্বসিত বাক্যভঙ্গি তাঁর উপন্যাসকে নৈর্ব্যক্তিক করে তুলেছে। পূর্বসূরী শরৎচন্দ্রের কৃতিত্বকে খাটো না করে হৃদয়-সর্বস্বতার অভিযোগ এনে তার থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করে গেছেন মানিক তাঁর সমস্ত সাহিত্য জীবন ধরে। বস্তুধর্মিতা ও ভাবাবেগ নিরপেক্ষ নিস্পৃহতা তাঁর উপন্যাসের বিষয় ও ভাষাভাবনাকে প্রভাবিত করেছিল। *'পদ্মানদীর মাঝি'* উপন্যাসে পদ্মানদীর বর্ণনা অসামান্য দার্শনিকতায় এ ভাষায় তুলে ধরেছেন—*'কোথাও নদীর একটি ছাড়া তটরেখা নাই কোথাও অপর তীরের গাছপালা অস্পষ্ট চোখে পড়ে। কাউয়া চিলা পাখিগুলি ক্রমাগত জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। বকেরা এখন একক শিকারী, সন্ধ্যায় ঝাঁক বাঁধিবে। স্টীমার, নৌকা, ভাসমান কচুরিপানা আকাশের পাখি ও মেঘ ভাসিয়া চলিয়াছে, তীরের দিকে চাহিয়া মনে হয় জলের সীমায় মাটির তীরভূমি ও জমি লঘুগতিতে চলিয়াছে পিছনে। ... তবু নদী ছাড়া সবই বাহুল্য। আকাশের রঙীন মেঘ ও ভাসমান পাখি, ভাঙন ধরা তীরে শুভ্রাকাশ ও শ্যামল তনু নদীর*

বুকে জীবনের সঞ্চালন, এসব কিছুই যদি না থাকে, শুধু এই বিশাল একাভিমুখী জল-স্রোত পদ্মার মাঝি ভালবাসিবে সারাজীবন।'[২৪] বঙ্গালী উপভাষার কাউয়া চিলা শব্দের পাশাপাশি তৎসম শব্দ শুভ্র,শ্যামলতরু একাভিমুখী শব্দের সহজ সহাবস্থান লেখকের বিশিষ্ট মানসিকতাকে তুলে ধরেছে। নদীপ্রবাহের মন্তর চলমানতার সুর ভাষায় স্পন্দিত হয়েছে। এই আপাত নিরাসক্ত অথচ তীব্র আসক্তিঘন ভাষার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের জীবনবোধ ও ভাষাভাবনার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। তবে মানিকের ভাষাশিল্প ক্রমেই পূর্বতন ও সমকালীন ধারার থেকে আলাদা হয়ে পড়েছে--সেই ব্যক্তিত্ব ব্যঞ্জক মৌলিকভাষা এই বিবৃতির 'তবু নদীছাড়া সবই বাহুল্য'—নিস্পৃহ উদাসীনতায় গড়া বাক্যগঠনে ধরা পড়েছে।

'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসে জীবন সম্পর্কিত তাঁর উপলব্ধি অমোঘ নিয়তির শক্তিময়তা ভাষায় আশ্চর্য শান্তসুরে প্রতিধ্বনিত করেছে এ ভঙ্গিতে—*'নদীর মতো নিজের খুশিতে গড়া পথে পথে কি মানুষের জীবনের স্রোত বইতে পারে? মানুষের হাতে কাটা খালে তার গতি, এক অজানা শক্তির অনিবার্য ইঙ্গিতে। মধ্যাকর্ষণের মতো যা চিরন্তন, অপরিবর্তনীয়।*'[২৫] —এ ভাষার আশ্চর্য শান্ত অথচ জোরালো শক্তিতে বিস্মিত হতে হয়। শরৎ-উত্তর কথাসাহিত্যের ধারায় উপন্যাসের ভাষা যে ক্রমেই তার পরিচিতি প্রচলিত ধারার খোলস থেকে বেরিয়ে নতুন নতুন ভাবে সেজে উঠে নিজেকে আলাদা ভাবে উপস্থিত করতে চেয়েছে সেটি কল্লোল গোষ্ঠীয় কবি-ঔপন্যাসিক বুদ্ধদেব বসুর বিদগ্ধ রুচিশীল ভাষায় স্বতঃউৎসারিত। তাঁর উপন্যাসের ভাষার কারুকলা নিঃসন্দেহ কৃতিত্বপূর্ণ। চেতনাপ্রবাহের স্বচ্ছন্দ বহমানতা এ ভাষায় উচ্ছ্বসিত। বস্তুত এই পর্বের লেখকেরা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। এই বিদ্রোহ ছিল মূলত রোমান্টিকতার উচ্ছ্বাস-ভাবাবেগের আতিশয্য ও একজাতীয় স্বপ্নবিলাসিতা। এদের ভাষার তীক্ষ্ণতা ও ভঙ্গির নতুনত্ব নতুন পরিবেশ ও নতুন মানুষের জীবন বিবরণ ও নরনারীর রোমান্টিক সম্পর্ককে বাস্তব করে তোলার দুঃসাহসী চেষ্টা—সবই সেই সমকালে ছিল অভিনব। পুরোনো সীমারেখা ভেঙেচুরে উপন্যাসকে নতুন আকার দেওয়া ও নতুন পথে পরিচালিত করার এদের দাবিদার বলা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত উপন্যাস-সাহিত্য বিবর্তনের যে প্রধান ধারা প্রবাহিত হয়েছে এরা সেই স্রোতের সঙ্গে না মিশে শাখাপথে পাড়ি জমিয়েছেন। এদের বিশেষত বুদ্ধদেব বসুর বিশেষত্ব হল এই যে ইনি গভীরভাবে গীতি-কাব্যধর্মী। বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের ভাষাকল্পে

কবিত্ব-শক্তির প্রকাশ ঘটলেও বুদ্ধদেবের কবিত্ব উপন্যাসের মধ্যে সর্বব্যপী ও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্লেষণ প্রণালী একান্তভাবে কাব্যধর্মী। তাঁর উপন্যাসে যে চরিত্রের ঘাত প্রতিঘাত ও মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ভাষায় প্রকাশিত সর্বত্রই কাব্যোচ্ছাসের প্রাধান্য।

'তিথিডোর' উপন্যাসের ভাষার কারুকলা সৌন্দর্যময় শিল্পিত আবেদনে উদ্ভাসিত হয়েছে এ ভাষায়—*"আবার চুপচাপ হাঁটলো দুজনে, কিন্তু জোড়াসাঁকোয় বিফল হয়ে মুক্তারামবাবু স্ট্রীট দিয়ে যেমন চুপচাপ হেঁটেছিল। 'সে রকম না; তখন গতি ছিল দ্রুত, গলি ছিল সরু, মন উৎকণ্ঠ — আর এখন চোখের সামনে চিত্তরঞ্জন এভিন্যুর ঋজুতা—মস্ত চওড়া দিলখোলা রাস্তা নিরিবিলি ট্রাম নেই, মোটরগুলো যেন আলগোছে ভেসে যাচ্ছে চুপচাপ, দুধারের মস্ত বাড়ি যেন দুপাড়ার—আর সমস্ত রাস্তাটির উপর কাঁপছে, দুলছে জ্বলছে বৃষ্টিধোয়া হলদে সবুজ বিকেলের স্বচ্ছ সূক্ষ্ম আভার একটি পরদা।'*[২৬] — এ ভাষার বাক্যগঠন, এর উৎপ্রেক্ষা অলংকার ব্যবহারের বিশেষ কাব্যধর্মী হয়েছে। দুটি হৃদয়ের নিবিড় একাত্মতার সাক্ষী হয়েছে মহানগরীর আলোকিত রাত্রি। তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলিও তার কাব্যময় ভাষার অনুরূপ *'রাত ভরে বৃষ্টি'* উপন্যাসের ভাষায় সেটিই প্রতিফলিত এ ভাবে—*'একদিন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠবে ওরা ... মালতী আর জয়ন্ত, আর নয়নাংশু কষ্ট করে মরে যাবে, ইচ্ছে মরে যাবে। শরীর ধ্বসে যাবে গণগনে রাগের আগুনে পড়ে থাকবে শুধু একমুঠো ছাই। এই তো। এখনই আর রাগ নেই ... দিনের আলো খবরের কাগজ ট্রামের শব্দ খবর কাগজ ... রোজ ... রোজ ... রোজ'*[২৭]—চরিত্রগুলির জীবন ভাবনা লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এ ভাষা গদ্য নয় যেন কবিতা। রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব বসুর ভাষারীতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন যে যেন কবির লেখা গল্প আখ্যানকে উপেক্ষা করে বাণীর স্রোত বেগে বয়ে চলেছে। একই সঙ্গে বুদ্ধদেব বসু কবি ও কথাশিল্পী। কবিমনের অন্তর্লীন অনুভূতির রোমান্টিক লিপিচিত্র তাঁর উপন্যাস,—যেখানে বস্তুজগতের বিষয়ভার অনুপস্থিত।

উপন্যাসের ভাষা-ভাবনায় অভিনবত্বের সংযোজন করেছেন 'অদ্ভুত আপৃথিবীর' কথাকার 'জীবনানন্দ দাশ'। কবি জীবনানন্দ লক্ষ করেছিলেন ধাবমান কাল — সমকালীন বিধ্বস্ত জীবন-বিনাশী সত্তার দিনলিপি। যুদ্ধ-মন্বন্তর-দাঙ্গায় বিধ্বস্ত বাংলাদেশে মূল্যবোধের ভয়ংকর বিপর্যয় ঘটেছে তাঁর পৃথিবীতে। তাই তিনি ভয়াবহ বিবমিষায় পীড়িত হয়েছিলেন। ঘনকুয়াশার ঘেরা ঘর তাঁর সমস্ত উপন্যাসেই ব্যক্ত। তাঁর প্রতিটি উপন্যাসেই মানসিক যন্ত্রণা তথা গভীর বেদনা প্রকাশিত

হয়েছে। বিষয়গত অভিনবত্বের পাশাপাশি ভাষাবয়সের নতুনত্ব পাঠককে বিস্মিত করে। *'মাল্যবান'* উপন্যাসে জটিল জীবন কাহিনি, ভাঙাচৌচির দাম্পত্য সম্পর্ক ব্যক্ত হয়েছে এ ভাষায়—*'হয়ত কলতলায় ভাঁড়ার ঘরে, গুদোমে দুটো বেড়াল মরিয়া হয়ে ঝগড়া করছে অনেকক্ষণ ধরে; তাদের একটি নর ও একটি মাদি নিশ্চয়ই; এই শীত রাতে এই আশ্চর্য শীত রাতে নিদারুণ কপট ঝগড়ার আড়ালে হলো আর মেনির এই অত্যদ্ভুত রক্তোচ্ছ্বাস কাম নিয়ে জীবনের যৌন ঋতুর, যৌন আগুনের এই প্রাণান্তকর দৌরাত্ম্যে—মাল্যবান দাঁত ফাঁক করে ভাবছিল।'*[২৮] বাক্যগঠনের জটিলতা জটিল জীবনেরই প্রতিলিপি হয়ে উঠেছে। মানবজীবনের ব্যর্থতা, সর্বত্র অচরিতার্থতার বেদনাবোধ ভাষাতে ব্যক্ত হয়েছে এ উপন্যাসের অন্যত্র —*'আমাদের জীবনের নদীর নাম অনুত্তরণ, মাল্যবান ভাবছিল, কোথাও কেউ উত্তীর্ণ হতে পারে না, কোনদিন এ নদীর পথে; কিন্তু তবুও কত লোক ব্যথা বিপদ বিকলতা মৃত্যুর বলে প্রতিদিন ওতরাচ্ছে।'*[২৯] —এ ভাষাভাবনার সর্বত্র চিন্তার ও চেতনার অবিন্যস্ত জটিলতার জাল ছড়ানো।

আধুনিক মানুষের চিন্তা ও বুদ্ধিজনিত যন্ত্রণার প্রতিফলন ঘটেছে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মনঃসমীক্ষণমূলক উপন্যাসের ভাষায়। খগেন বাবুর অন্তঃশীলা জীবনতৃষ্ণা সংসারের নানা অভিজ্ঞতার আত্মনিরীক্ষার ঘূর্ণাবর্ত পেরিয়ে কীভাবে মোহনায় এসে উপলব্ধি করেছে যে মানুষের জন্য বেঁচে থাকাতেই সার্থকতা তাই ব্যঞ্জিত হয়েছে এ উপন্যাসের ভাষায়। প্রতি মুহূর্তের হয়ে ওঠার ভেতরে যে অজস্র মৃত্যুর যন্ত্রণা—চেতনাপ্রবাহের নিরাসক্ত আত্মপ্রকাশের ভাষা এমনই—*'কাঠ ক্রমে ধরে উঠল, প্রথমে ধীরে ধীরে ক্ষণিক পরে জোরে অতি শীঘ্র দাউ দাউ করে। মাথার একরকম চুল গেল পুড়ে, কি দুর্গন্ধ! যেন উনুনে ফেন পড়েছে। সাবিত্রী একবার রাঁধতে গিয়ে উনুনের ওপর ভাতের হাঁড়ি ফাঁসিয়ে ফেলে। তখন তার চুল আধখানা বাঁধা ছিল। তাই দেখে খগেনবাবু বলেছিলেন — যে রাঁধে সে বুঝি চুল বাঁধে না। সাবিত্রী ভীষণ রেগে উত্তর দেয় এখান থেকে চলে যাও।'*[৩০] —স্ত্রীর শবদাহ দেখতে দেখতে খগেনবাবুর যে চিন্তাধারা তা চেতনানদীর আত্মপ্রকাশের ভাষায় প্রকাশিত। আবার অন্যত্র এই উপন্যাসের ভাষায় চরিত্রের পীড়িত অস্তিত্বের দাহ। ভাষায় সেই মনঃসমীক্ষণের প্রকাশ এমনই —*'শ্রাদ্ধ তিনি করবেন না। শ্রদ্ধা নেই তার শ্রাদ্ধ কি? এ দেশে এ সমাজে এ যুগে শ্রাদ্ধ অচল, চল হওয়া উচিত প্রায়শ্চিত্তের, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত।'* [৩১]

উপন্যাসের ভাষা-আলোচনায় কমলকুমার মজুমদার নতুন একটি মাত্রা সৃষ্টি করলেন। *'চিত্রল বা ভাস্কর্যকল্প বর্ণনার জন্য তিনি যে ভাষারীতির উদ্ভাবন করলেন তা যেমন অভিনব তেমন সংস্কারমুক্ত।'*[৩২] তাঁর ভাষাগত চিত্রাঙ্কনী ক্ষমতা প্রশংসিত হয়েছে বারবার। সমালোচক তাঁর ভাষাগত অভিনবত্বকে আলোচনা করেছেন। *'যে চিত্র তাঁর বিশাল অভিজ্ঞতা ও দিব্যদৃষ্টিপাতে সম্ভব হয়েছে, সে চিত্র সত্যের অন্তঃস্থলে ছুটে যায়।'*[৩৩] তাঁর গদ্যে আমাদের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণ ঘটে ও ভাষার বাহন ও ধারণ ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটে এবং বাংলা গদ্যের বিস্তার ক্ষমতা তাঁর সংস্পর্শেই সম্ভব হয়। ভাষাচিত্রী ও গদ্যকার কমলকুমারের *'অন্তর্জলীযাত্রা'*-র ভাষরীতি এমনই—*'একটি চিতা সাজানো হইয়াছে, উপরে বর্তমান সত্য যেন বা স্মৃতি হইয়া দেখা দেয়, যেখানে নক্ষত্র নাই। চিতার নিকটে বসিয়া একটি ক্রন্দনরত বালক, সে লাউডগা ... রুগ্ন সুন্দর পিণ্ড হাতে করিয়া বসিয়া আছে। তথাপি তাহার ক্রন্দনে আকাশ আঁকা ছিল, তখনও লহরীতত্ত্ব ছিল বালকের সম্মুখেই ব্রাহ্মণ'*[৩৪] —এ ভাষার গাঠনিক অভিনবত্ব তৎসমশব্দ প্রয়োগ—বাক্যাংশ সংযোজন — সর্বত্রই নতুনত্ব।

উপন্যাসের প্রারম্ভে চিরচলমান গঙ্গা নদীর বর্ণনা ঔপন্যাসিকের বিশিষ্ট ভাষারীতির উদাহরণ হয়ে আছে—*'অনতিদূরে উদার বিশাল প্রবাহিনী, গঙ্গা, তরল মাতৃমূর্তি যথা, মধ্যে মধ্যে বায়ু অনর্গল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে; এইস্থানে বেলতটে বিবশকারী উদ্বিগ্নতা ক্ষুদ্র একটি জনমণ্ডলীকে আশ্রয় করিয়া আছে। কোথাও কারণের বিকার মাত্র নাই, প্রতিবিম্ব নাই, কোথাও স্বপ্ন পর্যন্ত নাই; এ কারণে যে একটি মুহূর্তের সকল কিছুকে বাস্তব করত স্মরণীয় করিয়া একের যে নাম ভিন্ন ক্রমাগতই অপ্রাকৃতিক পার্থিব, তাহারই প্রাণ বায়ু নিষ্ক্রান্ত হইবে এবং তাই মানুষমাত্রই নিশ্চল।'*[৩৫]—অমৃত যাত্রার বাহক গঙ্গার স্বরূপটি বাক্যের বিন্যাসের জটিলতায়, শব্দ চয়নের বিশেষত্ব ছবির মতো চিত্রিত হয়েছে। এ ভাষারীতির নিজস্বতা সম্পর্কে সমালোচক মন্তব্য করেছেন —*'আধুনিক চিত্রকলায় শিল্পী যে দুঃসাহসিক স্বাতন্ত্র্যের চর্চা করেন কমলকুমারের গদ্যের সঙ্গে সেই স্বাতন্ত্র্যচর্চার স্বভাবাত্মক মিল আছে। অথচ বর্ণে, বিশেষণে, বিন্যাসে এ অন্তত এর উত্তম মুহূর্তে কখনো উপন্যাসাতিরিক্ত নয়।'*[৩৬] এ ভাষারীতির তিনিই একক পথিক।

উপন্যাসের ভাষা-ভাবনা আলোচনা সূত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসের ধারায় একটা ক্রমভাঙা নতুনত্ব এসেছে। বিষয়গত দিক ও আঙ্গিক রূপকল্প যুগপৎ দিকেই তার নব তাৎপর্য উদ্ভাসিত হচ্ছে। বস্তুত উপন্যাসের কাজ বাস্তবতার রূপায়ণ—বাস্তবতার অন্তর্নিহিত নির্যাসকে রূপায়িত করা। আধুনিক জটিল জীবনের বাস্তবতাকে আকৃতি দেবার জন্য আঙ্গিকের আধুনিক প্রথাবিরোধী উপস্থাপনের প্রয়োজন ক্রমেই দেখা যাচ্ছে। ইংরেজ সমালোচকের ভাষায় বলা যায়—'The writer has to set language on fire, put an end to its cogulated form and even go beyound it.'[৩৭]

প্রথাবিরোধী উপন্যাসের ভাষা রচনায় ঔপন্যাসিক অমিয়ভূষণ মজুমদার বিশিষ্টতম ব্যক্তিত্ব বিশেষ। তাঁর কথাসাহিত্যের ভাষা তার স্বভাবজাত চেনা পরিবেশ থেকেই সৃষ্ট। কোথাও কৃত্রিমতার লেশ নেই সে ভাষায়—ঔপন্যাসিকের মুখে শোনা যায় তারই স্বীকৃতি—*'আমি কোনো অঞ্চলের কথা বলতে চাইনি। আমি লোকের কথা বলতে চেয়েছি। মানুষের কথা বলতে গেলে তাকে মাটিতে দাঁড় করাতে হয়। মাথার উপরে আকাশ দিতে হয়, আবহাওয়া গাছ গাছড়া দিতে হয়। এসব করতে গিয়ে নিজের চোখে দেখা মাঠ, আকাশ, বন, মাছ আঁকা যত সহজ অন্যের মুখে অপরিচিত সময়ের কথা শুনে আঁকা ততটা ভালো হয় না। সেই জন্য হয়তো পদ্মা থেকে শুরু করে কাঞ্চনজঙ্ঘা এই ভূ-ভাগ আমি এঁকেছি।'*[৩৮]

পদ্মার ভাঙন ধরা তীরে ভূমিহীন, ভূমিলোভী ও ভূম্যধিকারীদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও তাদের বাঁচার চেষ্টার সমষ্টির পরিচয় উপন্যাসটিতে তুলে ধরেছেন। মানুষের জীবনের সঙ্গে জীবিকার সম্পর্ক, ছিন্নমূল হবার পূর্বক্ষণটিতে কোথায় টান পড়ে, কেমন করে বহুকালের সম্পর্ক গুঁড়িয়ে যায় —তারই আখ্যান *'গড় শ্রীখণ্ড'*। এর ভাষারীতি বিস্মিত করে এ ভাবে—*'ধান যখন নতুন বউ এর মতো পাত্রে-অপাত্রে অকাতরে সলজ্জ-হাসি বিলোচ্ছে তখন আহার করা এবং ধানের দিন সরে যেতে-যেতেই উপোস শুরু করার অভ্যাস ছিল তার। কিন্তু বাঙাল নদীর দু-পাড়ে সে-বার এক দুর্ভিক্ষ এলো। তারপর গ্রামের বাইরের জীবন। র‍্যাল, হাউইজাহাজ, সোলজর। আঘাতে-আঘাতে তার মনের পরিসীমা বিস্তৃত হতে লাগলো। বাঙাল নদীর হংসপক্ষ বিধৃত একটি দৃশ্যপটে সহসা যদি বনরাজির মাথা ছাড়িয়ে ধোঁয়াকলের চোং জেগে ওঠে, যদি চোং-এর ফাঁকে হাঙর রং-এর লোহার পাখি গর্জন করে উড়ে যায়, সুরোর মনের তুলনাটা দেওয়া যায় তাহলে'* [৩৯]—এরকমই

10 MAY 2013 250630 LIBRARY NBU. DARJEELING

বিশিষ্ট ভাষারীতি চরিত্রের অনুভবের প্রসঙ্গ পাই এভাবেই অন্যত্র—*'এরকম অনুভব সুরতুনের জীবনে কখনো হয়নি। হারমোনিয়ামওয়ালার অবাস্তব ভাষা অবাস্তব ভঙ্গি ভয় তার রোগা পক্কা চেহারা তাঁর বয়স সম্বন্ধে সুরতুনের নিজের ধারণা সুরতুনের একধরনের সাহস যুগিয়ে ছিল। গোঁসাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে টেপির মা যেমন টিপে টিপে হাসে তেমন অকুতোভয়তা তার কাছে অবিশ্বাস্য বোধ হত। কিন্তু তার নিজের মধ্যে কোথাও লুকানো ছিল এমনি যেন তার এই সাহসী সত্তার সাময়িক প্রকাশ।'*[৪০] — প্রথাবিরোধী বাক্যবিন্যাসের দৃষ্টান্ত হয়েছে এর ভাষাকল্প। উপন্যাসের ভাষা যে সর্বত্রই প্রচলিত প্যাটার্ন অনুযায়ী চলবে না, সেটি যে এক স্বতঃস্ফূর্ত মাধ্যম যেখানে কোনো তত্ত্ব চলে না স্বয়ং ঔপন্যাসিক অমিয়ভূষণ সে বিষয়ে মন্তব্য করেছেন—*'উপন্যাস তত্ত্ব নয়। এবং বোধ হয় সেজন্যই উপন্যাসের ভাষাও বাক্যের পর বাক্য বসানো নয়। ...আমরা সবাই জানি শব্দগুলি শব্দ মাত্রই, বাক্যে বসে যখন পদ হয় তখনই মাত্র জীবন পায় তেমনি বলা যায় বাক্যগুলি বাক্যমাত্রই, যখন তারা পরস্পরকে আকর্ষণ করছে তখনই তারা এক মুহূর্তের বেশী জীবন্ত থাকে।'*[৪১]

উপন্যাসের ভাষার আবহমানতায় দেবেশ রায় অভিনবত্বের দাবিদার। তাঁর রচিত উপন্যাস *'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'*-এর গদ্য ভাষা সমকালীন উপন্যাসের ভাষা-প্রবাহে নতুন তরঙ্গ সংযোজন বলা যায়। এ ভাষা একান্তই বিশেষ নদী পরিবৃত অঞ্চলের গ্রাম্য বনজ গন্ধসহ সহজ সাবলীল যেটি তার বাক্যবন্ধে ও শব্দচয়নে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ধরা দিয়েছে—*'নিতাইদের চর থেকে নদী হয়ে মাইল আট আর জলপাইগুড়ি শহর হয়ে মাইল চার ভাটিতে এই দুই নম্বরটাও ত লোকের মুখে মুখে। আসলে এটা তিস্তার বছরে আট মাসের শুকনো গাত বাকি চার মাসও শুকনো থাকতে পারে যদি তিস্তা অন্য দিক দিয়ে বয়ে যায়। তেমন পরপর তিন বছর গেল বলেই মানুষজন নামল তারপর ঘরও উঠল, কলাগাছও ফাঁপল আর একসারি সুপুরি গাছও সাঁইসাঁই করে বাড়ল।'*[৪২] —ভাষার বিশেষ ভঙ্গি উপন্যাসের অন্যত্র ধরা পড়ে —*'এখন সারারাত সারাদিন ফরেস্টের পর ফরেস্ট, নদীর পর নদী হাটের পথ পেরতে পেরতে তাদের কথা হবে, তারা দুজনে দুজনকে কত জানবে, তাদের কতবার ঘুম পাবে আবার কতবার জাগরণ ঘটবে তারা দুজনের কাছে, কত অপরিহার্য হয়ে উঠবে। সে ত আর এক স্বতন্ত্র বৃত্তান্ত এখানেই শেষ হোক।'*[৪৩] উপন্যাসের ভাষা উপন্যাসের চরিত্রদের সঙ্গে সঙ্গে অবিরত চেনা অচেনা খানাখন্দ পেরিয়ে নতুন পথের সন্ধানে যেন বেরিয়ে পড়েছে।

আলোচনা সূত্রে আমরা লক্ষ করলাম, উপন্যাসের ভাষা লেখকের জীবনদৃষ্টি ও দর্শনের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। বাক্যযোজনায়, শব্দপ্রয়োগে, বর্ণনায় এবং চিত্রকল্প নির্মাণে সর্বত্র ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয়। ঔপন্যাসিক ভাষা দিয়ে জীবনের ছবি আঁকেন। তিনি জীবনকে যেভাবে উপলব্ধি করেন ভাষায় তারই অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে। ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিপুরুষই বাণীভঙ্গিমার জনক। তবে লেখকের ব্যক্তিত্ব প্রচ্ছন্ন থাকে, বড় হয়ে ওঠে বিষয়বস্তু। পাঠকের মন জুড়ে থাকে বিষয়বস্তু অর্থাৎ জীবনের প্রসঙ্গ। সব উপন্যাসের বিষয় যেমন এক থাকে না তেমনি সব উপন্যাসও এক ভাষায় রচিত হয় না। তবে উপন্যাসের ভাষাকে বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না কারণ ভাষার জন্য আমরা উপন্যাস পড়ি না, জীবনকে অনুভব করার জন্য উপন্যাস-পাঠ করি। জীবনের সমগ্রতা তার সার্বিক ব্যাপ্তির অনুসন্ধান আমাদের পাঠকবর্গের লক্ষ থাকে যে-কারণে ভাষার দুর্বলতাকেও আমরা স্বচ্ছন্দে স্বীকার করে নিই।

তবে একথা স্বীকার করতেই হয় ভাষারীতি উপন্যাস-নিরপেক্ষ কোনো বিষয় নয়। বিভিন্ন উপন্যাসের ভাষারীতিতে বিচিত্রতা দেখা যেতে পারে তবে এ বিষয়ে একটা শর্ত অবশ্যই থাকে। সেটি হল সাহিত্যের ভাষা যেন জীবনের বাস্তবতা ও জীবনের কাব্যকে তুলে ধরে। বিভিন্ন উপন্যাসে বিভিন্ন ভাষারীতি ব্যবহৃত হলেও কথাসাহিত্যিকদের সকলেরই একটি বিশেষ সাদৃশ্য থাকবেই এ বিষয়ে — সেটি হল এই যে উপন্যাসে ব্যবহৃত ভাষা-ভাবনা যেন জীবনের বাস্তবতা ও জীবনের কাব্য দুইকেই তুলে ধরতে সক্ষম হয়।

বিশ্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসের ভাষা সম্বন্ধে ভাবনায় ঐক্যমত নেই। এর থেকে এটিই প্রমাণিত হয় যে ভাষা পছন্দসই না হলে শিল্পকর্ম ভালো হবে না এ ধারণা ঠিক নয়। উপন্যাসের ভাষারীতির কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা হয় না। জীবনের রঙ রূপ যেমন বিচিত্র, জীবনের রূপদানকারী উপন্যাসের ভাষাও তেমনি বর্ণময় বহুবিচিত্র। সেই বিচিত্রতা সম্পাদনে প্রচলিত ব্যাকরণ বিধি অতিক্রম করার একটা প্রয়াস থেকে যায় যা সাহিত্য সমালোচক ও পাঠকের বিস্ময়ের সৃষ্টি করেই চলে' —সমালোচক বলেছেন এ প্রসঙ্গে 'The description and narrative passage will be written in the Novelist's own style. Which is usually correct and often highly decorate and individual but when words are put into the mouth of the various characters, they are made to speak much as they would speak

in real life. Whether they speak correctly or not, they must have a diction suitable to their character's education environment and personal.'[৪৪] এ বিষয়ে বলা যায় যে বিবিধ প্রকরণের মধ্যে কথাসাহিত্যের স্বাধীনতা সর্বাপেক্ষা বেশি। কাব্যকবিতায় যেখানে ছন্দোবদ্ধ বাক্‌রীতি ও নাটকের ক্ষেত্রে যেখানে ভাষা একজাতীয় সংলাপ-নির্ভর, সেক্ষেত্রে কথাসাহিত্যের শোষণশক্তি বেশি হওয়ায় তার ভাষারীতি বিবিধ অভিব্যক্তিময়। ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলা যায় —*'মানুষ নির্মাণ করে প্রয়োজনে, সৃষ্টি করে আনন্দে। তাই ভাষার কাজে মানুষের দুটো রিভাগ আছে —একটা তার গরজের, আর একটা তার খুশির, তার খেয়ালের। আশ্চর্যের কথা এই যে, ভাষার জগতে এই খুশির এলাকায় মানুষের যত সম্পদ সযত্নে সঞ্চিত এমন আর কোন অংশে নয়। এইখানে মানুষ সৃষ্টিকর্তার গৌরব অনুভব করেছে, সে পেয়েছে দেবতার আসন'*[৪৫] আমাদের দেহের নানাপ্রকার শরীরযন্ত্রের অবস্থান সম্পর্কে আমরা যেমন সদা সচেতন থাকি না অথচ তাদের বহন করে চলি তেমনি সভ্যতার প্রারম্ভ-লগ্ন থেকে আমাদের ভাষাকে আমরা দিনরাত্রি বহন করে চলেছি। শব্দপুঞ্জে লিঙ্গে-সমাসে-সন্ধি-প্রত্যয়ে সে ভাষা জটিল হলেও তার কোনো ভার নেই — তার সংগতি ও অসংগতি নিয়ে আমরা মাথা ঘামাইনা।

বস্তুত উপন্যাসের ভাষার আশ্চর্য রহস্য চিন্তা করে বিস্মিত হতে হয়। এ ভাষার প্রাণশক্তি, এর নব নব রূপ, এর পাঠক-হৃদয় আকর্ষণের ক্ষমতায় মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। ভাষার এই সার্বিক বহুধা বিস্তৃত শক্তিকে সমালোচক রবীন্দ্রনাথ যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন উপন্যাসের ভাষা-আলোচনাতেও সেই বক্তব্য সমভাবে প্রযোজ্য হয়ে যায় —*'আমাদের প্রাণশক্তি যেমন প্রতিনিয়ত বর্ণে গন্ধে রূপে রসে বোধের জাল বিস্তার করে চলেছে, আমাদের ভাষাও তেমনি সৃষ্টি করছে কত ছবি, কত রস তার ছন্দে। কত রকমের তার জাদুশক্তি। মানুষ যখন কালের নেপথ্যে অন্তর্ধান করে তখনো তার বাণীর লীলা সজীব হয়ে থাকে ইতিহাসের রঙ্গভূমিতে। আলোকের রঙ্গশালায় গ্রহতারার নাট্য চলেছে অনাদিকাল থেকে। তা নিয়ে বিজ্ঞানীর বিস্ময়ের অন্ত নেই। দেশকালে মানুষের ভাষারঙ্গের সীমা তার চেয়ে অনেক সংকীর্ণ, কিন্তু বাণীলোকের রহস্যের বিস্ময়করতা এই নক্ষত্রলোকের চেয়ে অনেক গভীর ও অভাবনীয়। নক্ষত্রলোকের তেজ বহু লক্ষ তারা চলার পথ পেরিয়ে আজ আমাদের চোখে এসে পৌঁছল, কিন্তু তার চেয়ে আরো অনেক বেশি*

আশ্চর্য যে, আমাদের ভাষা নীহারিকা চক্রে ঘূর্ণ্যমান সেই নক্ষত্রলোককে স্পর্শ করতে পেরেছে।'[৪৬] উপন্যাসের ভাষাও নক্ষত্রলোকের বহু লক্ষ তারার চলার পথ পেরিয়ে এগিয়ে চলেছে দূর লক্ষ্যকে স্পর্শ করার মানস অভিপ্রায়ে। কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখায় তাকে বন্দি করা দুঃসাধ্য।

তথ্যসূত্র ঃ

১. রায়চৌধুরী গোপিকানাথ, রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণ শিল্প; ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট কলকাতা - ৭৩, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৪, পৃ. ২১১।

২. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, বাংলাভাষা পরিচয়; রবীন্দ্র রচনাবলী (ত্রয়োদশ খণ্ড), ৬, আচার্য জগদীশবসু রোড, কলকাতা - ১৭, বিশ্বভারতী, ১৪০২ সংস্করণ, পৃ. ৫৭২।

৩. সেন সুকুমার, ভাষার ইতিবৃত্ত; আ: পা: প্রা: লি:, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৯, সপ্তম মুদ্রণ ১৯৯৯, প্রথম প্রকাশ: ১৩৩১, পৃ. ১৫।

৪. বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর; ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা - ৭৩, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ ১৩৮৭, পরিবর্ধিত প্রথম দে'জ সংস্কণ, পৃ. ৪১।

৫. সান্যাল অবন্তীকুমার, রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি; সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬ বিধান সরণি, কলিকাতা - ৬, প্রথম প্রকাশ ১৩৭৬, পৃ. ১০৬।

৬. দাশ শিশিরকুমার, কাব্যতত্ত্ব ও অ্যারিস্টটল; প্যাপিরাস, গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলিকাতা - ৪,প্রথম সংস্করণ ১৯৮৬, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯২, পৃ. ২৭।

৭. সরকার পবিত্রকুমার, গদ্যরীতি পদ্যরীতি; সাহিত্যলোক, ৩২ বিডন রো, কলকাতা - ৬, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫, পৃ. ৭৪-৭৫।

৮. Boulton Marjonie Anatomy of prose : The Sentence : Chapter - 3, Add pub-Routledge & Kegan paulltd Broad way House, Carter lane London, Pub 1954, p. 24.

৯. Lodge David Language of Fiction, London Add-New York : Columbia University Press, Pub - 1966 in Great Britain, p. 51.

১০. Lodge David, Do, p. 51.

১১. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, বাংলা ভাষা পরিচয় : রবীন্দ্র রচনাবলী (ত্রয়োদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী); ৬, আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা - ১৭, ১৪০২ সংস্করণ, পৃ. ৫৬৯।

১২. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, বাংলা ভাষা পরিচয়; ঐ, পৃ. ৫৮১।

১৩. চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, বিষবৃক্ষ : বঙ্কিম রচনাবলী, (প্রথম খণ্ড), সাহিত্য সংসদ; ৩২ এ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা - ৯, প্রথম প্রকাশ ১৩৬০, নবম প্রকাশ ১৩৮৭, পৃ. ২০৯।

১৪. চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিম, রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, রজনী; ঐ; পৃ. ৪৮৪।
১৫. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, বউ ঠাকুরানীর হাট : রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড বিশ্বভারতী - ৬, ৬, আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা - ১৭, ১৪০২ সংস্করণ, পৃ. ৬৫৭।
১৬. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, শেষের কবিতা; পঞ্চম খণ্ড, ঐ, পৃ. ৫১৭।
১৭. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, চতুরঙ্গ; চতুর্থ খণ্ড, ঐ; পৃ. ৪৪৪।
১৮. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, মালঞ্চ; ষষ্ঠ খণ্ড, ঐ; পৃ. ৪৭৮।
১৯. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত; শরৎসাহিত্য সমগ্র - ১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৯, ১৪০২ সংস্করণ, পৃ. ৩২৫।
২০. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্ত; প্রথম পর্ব, ঐ; পৃ. ৩০৪।
২১. শিকদার অশ্রুকুমার, আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস; অরুণা প্রকাশনী - ৭, যুগলকিশোর দাস লেন, কলকাতা - ৬, প্রথম প্রকাশ ১৩৯৫, তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ ২০০৩, পৃ. ৪৬।
২২. গুপ্ত জগদীশচন্দ্র, অসাধুসিদ্ধার্থ; গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ৭৩, এ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, প্রথম প্রকাশ ১৩৮৪, পৃ. ১২০।
২৩. গুপ্ত জগদীশচন্দ্র, লঘু গুরু; ঐ, পৃ. ৩৪।
২৪. বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক, পদ্মানদীর মাঝি; বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বি. বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা - ৭৩, ত্রয়োবিংশ মুদ্রণ ১৩৮৯, পৃ. ৭৩।
২৫. বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক, পুতুল নাচের ইতিকথা; প্রকাশ ভবন, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা - ৭৩, পঞ্চদশ মুদ্রণ ১৩৮৫, পৃ. ২৪২।
২৬. বসু বুদ্ধদেব, তিথিডোর, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড জে. এন. সিংহ ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা - ১৩, পঞ্চদশ মুদ্রণ ১৩৮৫, পৃ. ৪৮৪।
২৭. বসু বুদ্ধদেব, রাত ভরে বৃষ্টি; এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা - ১২, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৭, পৃ. ১০৪।
২৮. দাশ জীবনানন্দ, মাল্যবান; (জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস সমগ্র), দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ, ২১ শে বইমেলা ২০০০ উপলক্ষ্যে, প্রকাশক - 'গতিধারা', সিকদার আবুল বাশার, ৩৮/২ - ক বাংলা বাজার, ঢাকা - ১১০০, পৃ. ৭৭৫।
২৯. দাশ জীবনানন্দ, মাল্যবান; ঐ, পৃ. ৮১৯।
৩০. মুখোপাধ্যায় ধূর্জটিপ্রসাদ, অন্তঃশীলা (ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী); দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫, দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ ২০০২, কলকাতা - ৭৩, পৃ. ৭৬।
৩১. মুখোপাধ্যায় ধূর্জটিপ্রসাদ, অন্তঃশীলা; ঐ; পৃ. ৭৫।
৩২. বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর; দে'জ পাবলিশিং ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা - ৭৩, পরিবর্ধিত প্রথম দে'জ সংস্করণ জুন ১৯৮০।

৩৩. চক্রবর্তী সুব্রত, শ্রী কমল কুমার মজুমদারের পরিপ্রেক্ষিত এক্ষণ শারদীয়; ১৩৮২, পৃ. ২২২।
উৎস ঃ আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাসঃ অশ্রুকুমার সিকদার, অরুণা প্রকাশনী ৭, যুগল কিশোর দাস লেন, প্রথম প্রকাশ ১৩৯৫, তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ ২০০৩, কলকাতা - ৬, পৃ. ২৬৯।
৩৪. মজুমদার কমলকুমার, অন্তর্জলী যাত্রা, সুবর্ণরেখা - ইন্দ্রনাথ মজুমদার; ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা - ৯, ১৩৬৯, পৃ. ৫।
৩৫. মজুমদার কমলকুমার, অন্তর্জলী যাত্রা; ঐ; পৃ. ১৩৬।
৩৬. বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ বাংলা উপন্যাসের কালান্তর দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা - ৭৩, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, প্রথম প্রকাশ ১৯৬২, পৃ. ৫৫।
৩৭. কোর্তামার হুলিয়োঃ Hopscotch ঃ উৎসঃ আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস; অশ্রুকুমার সিকদার ঃ অরুণা প্রকাশনী ৭, যুগলকিশোর দাস লেন, কলকাতা - ৬, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮, পৃ. ২৫৭।
৩৮. মজুমদার অমিয়ভূষণ উৎসঃ আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস ঃ অশ্রুকুমার শিকদার, অরুণা প্রকাশনী ৭, যুগলকিশোর দাস লেন, কোলকাতা - ৬, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৮, তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ ২০০৩, পৃ. ২৫৭।
৩৯. মজুমদার অমিয়ভূষণ, গড়, শ্রীখণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, ১৯৮৭, পৃ. ১০।
৪০. মজুমদার অমিয়ভূষণ, গড় শ্রীখণ্ড, পৃ. ২৩৮।
৪১. মজুমদার অমিয়ভূষণ : উৎস বাংলা গদ্য জিজ্ঞাসা- সম্পাদক অরুণকুমার বসু, সমতট প্রকাশনী ১৭২, রাসবিহারী এভিনিট, কলকাতা - ২৯, প্রথম প্রকাশ ১৯৮২, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৮৭, পৃ. ১৫৪।
৪২. রায় দেবেশ, তিস্তাপারের বৃত্তান্ত; দে'জ পাবলিশিং ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭৩, প্রথম প্রকাশ ১৩৯৫, পৃ. ৩৭৫।
৪৩. রায় দেবেশ, তিস্তাপারের বৃত্তান্ত; ঐ; পৃ. ৮৩৯।
৪৪. Boulton Marjorie : The Anatomy of prose : Chap - IV : The Sentence written and spoken : Broadway House : Carter Lone : London.
৪৫. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, বাংলা ভাষা পরিচয় ঃ রবীন্দ্র রচনাবলী (ত্রয়োদশ খণ্ড), বিশ্বভারতী ঃ ৬, আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা - ১৭, ১৪০২ সংস্করণ, পৃ. ৫৭৭।
৪৬. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, বাংলা ভাষা পরিচয় ঃ রবীন্দ্র রচনাবলী ঃ ত্রয়োদশ খণ্ড ঃ বিশ্বভারতী, ৬, আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা - ১৭, ১৪০২ সংস্করণ, পৃ. ৬২৩।

****